বাইবেলের স্বরূপ ও তার বঙ্গানুবাদ প্রসঙ্গ

সুরঞ্জন মিদ্দে

বাইবেলের স্বরূপ

'বাইবেল' শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'Biblia' থেকে যার অর্থ গ্রন্থ-সমূহ। মূল গ্রিক শব্দ 'Biblos'। এই 'Biblos' শব্দটি প্যাপিরাস নামক গাছের বল্কলের ভিতরের অংশকে চিহ্নিত করত। প্রাচীনকালে প্যাপিরাসের বল্কলের মধ্যে গ্রন্থ লেখা হত বলে সমস্ত গ্রন্থকে 'Biblia' বলা হত। আবার প্রাচীন গ্রিকেরা তাদের ধর্মগ্রন্থগুলোকে 'ta biblia' বলত। ল্যাটিন 'Biblia' যদিও বহুবচন, ভ্রান্তরূপে স্ত্রীলিঙ্গে একবচন ব্যবহৃত হত। এই সূত্র ধরেই সকলে একমত যে, ধর্মগ্রন্থগুলো একটি পরিপূর্ণ গ্রন্থরূপে ঈশ্বরের বাণী হিসাবে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছে। এই জন্য 'Biblia' শব্দটি একবচন রূপে মানুষের স্বীকৃতি পায়। পরবর্তী সময়ে ইহুদি ও খ্রিস্টানেরা এই পবিত্র গ্রন্থগুলোকে 'The Scriptures বলে পরিচিত করে তোলে। পরে ইউরোপীয় ভাষায় এ গ্রন্থকে 'Bibla' হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

বাইবেল খ্রিস্টানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। নানান অর্থে বাইবেল অনন্য। বাইবেলকে সর্বোত্তম গ্রন্থ বলা যায়। বর্তমান পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি মানুষ বাইবেল পড়ে। বিশ্ব-সাহিত্যে সর্বাধিক বিক্রিত গ্রন্থ। আর কোনও গ্রন্থ এতগুলি ভাষায় এবং এত অধিক সংখ্যক সংস্করণে প্রকাশিত হয়নি। বাইবেলের দুটো অংশ। প্রথমটির নাম 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' ও শেষ অংশটি 'নিউ টেস্টামেন্ট' নামে পরিচিত। এই 'Testament' শব্দটি ল্যাটিন 'testamentum' শব্দ থেকে গৃহীত, অর্থ দানপত্র। এক সময় 'Testamentum'-এর স্থলে অন্য একটি শব্দ 'Instrumentum' ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়েছিল, অর্থ 'নিশ্চিতনথি' বা 'authorised document'। কিন্তু Testament কথাটাই পরিচিত ও গ্রহণীয় হল। কারণ মূলত এতে কিছু সিদ্ধান্ত বা ঈশ্বরের রায় (Judgement of God) বিধৃত হয়েছে। সেই সঙ্গে ঈশ্বরের নির্বাচিত প্রতিনিধির সাথে চুক্তির স্বাক্ষর বহন করছে। এইরূপে 'Old Testament' হল ইহুদি নেতাদের সঙ্গে (নোহ/আব্রাহম) ঈশ্বরের চুক্তি। আর 'New Testament' হল ঈশ্বরের সঙ্গে যিশুখ্রিস্টের চুক্তি। বাইবেল বহু পুস্তকের সমন্বয়ে সংকলিত। বর্তমানে প্রচলিত বাইবেলের মোট ৬৬টি পুস্তক আছে। তার মধ্যে 'ওল্ডটেস্টামেন্টে' আছে ৩৯টি আর 'নিউটেস্টামেন্টে' আছে ২৭টি পুস্তক। তবে এই ৬৬টি পুস্তক ছাড়া আরও ১৪টি পুস্তক আছে। যা 'অ্যাপ্রোক্রিফা' নামে

পরিচিত। 'অ্যাপোক্রিফা'র অর্থ হল 'গুপ্তপুস্তক'। কেবল যাদের জন্য লেখা হয়েছে তারাই এটা পাঠ করে বুঝতে পারবে। 'অ্যাপোক্রিফা'কে ওল্ড টেস্টামেন্ট' ও 'নিউ টেস্টামেন্ট' মধ্যবর্তীকালীন পুস্তক বলা হয়। 'ওল্ড টেস্টামেন্টের' শেষ পুস্তক লেখার সময় থেকে ৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ২৫০ বছরের ধর্ম, ইতিহাস, (গ্রিক, সিরিয়া, মিশর ও রোমীয়দের অধীন ইহুদিদের সম্পূর্ণ বিবরণ) এবং খ্রিস্টের আগমনের জন্য ইহুদিদের প্রস্তুতি ও আশা ইত্যাদি বিষয় 'অ্যাপোক্রিফা'র মধ্যে পাওয়া যায়। ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খ্রিস্টানেরা খোলা মনে 'অ্যাপোক্রিফা' সহ সম্পূর্ণ বাইবেলে আস্থা রাখতেন। কিন্তু মার্টিন লুথারের সংস্কারের পরবর্তীকালে জার্মান খ্রিস্টানেরা 'অ্যাপোক্রিফা'কে বাইবেল থেকে বাদ দিলেন। অবশ্য রোমান ক্যাথলিক, গ্রিক ও সিরিয়া চার্চ 'অ্যাপোক্রিফাকে' বাদ দেয়নি।

'অ্যাপোক্রিফা' ইহুদিদের হিব্রু ভাষায় লিখিত; এটি বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ফলে যিশুখ্রিস্ট যে ধর্ম পুস্তক (ওল্ড টেস্টামেন্ট) ব্যবহার করতেন, তা ছিল 'অ্যাপোক্রিফা' বিহীন। মার্টিন লুথার অ্যাপোক্রিফা'কে 'গৌণপুস্তক' বলে অভিহিত করায় প্রোটেস্ট্যান্ট জগতে 'অ্যাপোক্রিফা'র ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায়। 'অ্যাপোক্রিফার' বিশেষ অবদান এই যে, এর মাধ্যমে 'নিউটেস্টামেন্টের' পটভূমির পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। 'অ্যাপোক্রিফা' পাঠ করলে নিউ টেস্টামেন্টের কলা, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও ধর্মকে সম্পূর্ণ ভাবে বুঝতে সাহায্য করে। 'অ্যাপোক্রিফা' ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্টের সংযোজক সেতু হিসেবে চিহ্নিত। 'অ্যাপোক্রিফা'কে ৫০০ বছর উপেক্ষা করার ফলে বাইবেল যে অসম্পূর্ণ অবস্থাতে আছে, তা বলা বোধ হয় অত্যুক্তি নয়। এখানে উল্লেখ্য যে, 'ভারতের বাইবেল সোসাইটি' 'অ্যাপোক্রিফা' সম্বন্ধে সচেতন হয়েছেন। কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় 'অ্যাপোক্রিফা' অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে বাংলা ভাষায় 'অ্যাপোক্রিফা' অনূদিত হবে।

বাইবেলের দুটি অংশের পুস্তকগুলির গঠন (আকৃতিগত) এবং বিষয়ের মধ্যে বিভিন্নতা দেখা যায়। কতকগুলি যথেষ্ট বড়ো আবার কতকগুলি বিষয় হিসাবে খুবই ছোটো। যেমন — ইতিহাস বিবরণ, কবিতা, প্রবাদবাক্য, ভবিষ্যৎবাণী, পত্রাবলি ইত্যাদি। বাইবেল কোনো একজন ব্যক্তির দ্বারা লেখা নয়। একই সময়ে লেখাও নয়। অন্তত ৫০ জন ব্যক্তির দ্বারা প্রায় ১৬০০ বছর ধরে লেখা। বাইবেলের প্রাচীনতম অংশটি (যিশুখ্রিস্টের জন্মের আগে) ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মোশির দ্বারা লিখিত হয়েছিল এবং সর্বশেষ পৃষ্ঠাগুলি যিশুখ্রিস্টের জন্মের পরে; ৯৬ খ্রিস্টাব্দে শিষ্যদের দ্বারা লেখা হয়েছিল। গ্রন্থকার ছিলেন রাজা, পুরোহিত, নবী আবার কেউ-বা মেষপালক, চিকিৎসক ও করগ্রাহী। বাইবেলের স্থান, কাল ও সময়ের বিভিন্নতা সত্ত্বেও প্রথম থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত এক অসাধারণ ঐক্য দেখতে পাওয়া

যায়। সমগ্র ৬৬টি পুস্তকের প্রধান বিষয় যিশুখ্রিস্ট। ওল্ড টেস্টামেন্টে যিশুখ্রিস্ট সম্পর্কে অসংখ্য ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে। নিউ টেস্টামেন্টে পৃথিবীতে তাঁর মানব জীবনের কথা বলা হয়েছে।

বাইবেল মূলত প্রেমেরই এক কাহিনি। প্রেম-স্বরূপ ঈশ্বর সুন্দর পৃথিবী সৃষ্টিতে নিজেকে প্রকাশ করেন। মানুষকে নিজ প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করে তাকে প্রেমিক হওয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন। বাইবেল, ঈশ্বর ও মানুষ এবং মানুষ ও মানুষের প্রেম বন্ধনের কথা বলে। বাইবেলে যিশুখ্রিস্টই মানুষ ও ঈশ্বরের মিলনের পথ। খ্রিস্টধর্মের মূল কথাই হল যিশু মানবরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন মানবজাতির মুক্তির জন্য। বাইবেল মানব ও ঈশ্বরের পবিত্র ও নৈতিক জীবন-যাপনের পটভূমিতে আলোচিত। সত্য-পথ-নির্বাচনে বাইবেল মানবজাতির বিশেষ সহায়ক। বাইবেলে বর্ণিত ঐশ্বরিক করুণা, প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা, বিশ্বাস ও ক্ষমার আলোতেই খ্রিস্টীয় চার্চ পরিচালিত হয়। খ্রিস্টধর্মের মূল কেন্দ্রে আছেন যিশুখ্রিস্ট। যিশুখ্রিস্টের জীবন, শিক্ষা এবং বাণী অবলম্বনেই অনন্ত পরমেশ্বর সম্পর্কে উপলব্ধি সম্ভব। পিতা-পুত্র-পবিত্রআত্মা, ঈশ্বরের এই ত্রিত্ত্ববোধই পরমেশ্বরের ধারণা জাগাতে সক্ষম। যিশুখ্রিস্টই ঈশ্বরের ও মানুষের যোগাযোগ কেন্দ্র। যিশুখ্রিস্টই অনন্ত ঈশ্বরের দৃশ্য প্রকাশ। অব্যক্ত পরমের ব্যক্ত জ্ঞান। খ্রিস্টিনদের মতে ঈশ্বরকে জানতে হলে একমাত্র যিশুর মাধ্যমেই তা সম্ভব। খ্রিস্টীয় মতে জিতেন্দ্রিয় এবং আত্মশুদ্ধ হওয়াই ঈশ্বরের ক্ষমালাভ। পাপ স্বীকারের মাধ্যমে অন্তরের গ্লানি দূর হয়। অনুশোচনার দহনে আসে আত্মশুদ্ধি। ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা তাই সকল খ্রিস্টানদের অবশ্য কর্তব্য। মিলনের মাধ্যমে জাগে সংহত শক্তি। মিলিত উপাসনায় আন্তরযোগ হয় একমুখী। ফলে গড়ে ওঠে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব। খ্রিস্টধর্ম তাই বিশ্রামবারে (রবিবারে) চার্চে জমায়েত হয়ে, একত্রে সকলকে উপাসনা করতে হয়ে। বিশ্বাস, সততা এবং প্রেম এই তিনের অধিকারী ঈশ্বরের প্রীতিলাভে সক্ষম। যিশুখ্রিস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হলেও তিনি অক্ষত অমর। এই ক্রুশ খ্রিস্টানদের বিশেষ প্রতীক। শোক-দুঃখ, দারিদ্র্য প্রভৃতি জাগতিক বাধার প্রতীক ক্রুশ।এই ক্রুশ প্রতিদিন বহন করতে হয়, প্রতিটি খ্রিস্টানকে। কিন্তু ক্রুশ বহনকারী যিশুকে স্মরণ করায় দুঃখের গ্লানি যায় কেটে। যিশুখ্রিস্ট অনন্ত ঈশ্বরের প্রেমের প্রতীক। ঈশ-মানব খ্রিস্টের প্রতি ভক্তিপূর্ণ বিশ্বাস এবং তাঁর সঙ্গে জীবন সংযোগ হল খ্রিস্টধর্মের সারকথা।

বাইবেল ও লোকপুরাণ

যিশুখ্রিস্টের জন্মের চার হাজার বছর আগেই সৃষ্টি হয়েছিল বাইবেলের লোকপুরাণ। ভূমধ্যসাগরের ধার ঘেঁষে প্যালেস্টাইন। যার প্রাচীন নাম ছিল 'কোনান'। একে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল এক প্রাচীন সভ্যতা। ইহুদিদের সভ্যতা, যাদের মুখ্য

ধর্মপুস্তক হল বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট। এই ওল্ড টেস্টামেন্টে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য লোকপুরাণের কাহিনি। বাইবেল, বিশেষত তারই অন্তর্গত লোকপুরাণ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে শুধু মেসোপটামিয়া বা ব্যাবিলনের কথা নয়, আলোচনা করা প্রয়োজন আরও কয়েকটি প্রাচীন সভ্যতার কথা। তার একটি হল বর্তমান সিরিয়ার উত্তরে বসবাসকারী উগারিটীয় (ugarittio) সভ্যতা। এদের লোকপুরাণ ছিল যথেষ্ট সমৃদ্ধ। বাইবেলে উগারিটীয় পুরাণের প্রভাব বার বার দেখা যায়। আরেক প্রাচীন সভ্যতা এই অঞ্চলে ছিল, হিত্তীয় (Hittito) সভ্যতা। এদের বসবাস ছিল এশিয়া মাইনর অর্থাৎ বর্তমান তুরস্কে। এরা কিন্তু সেমিটীয় ছিলেন না। যিশুখ্রিস্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগে থেকে প্রায় দুই হাজার বছর ধরে এদের প্রতাপ বজায় ছিল। এছাড়া আরও একটি সভ্যতা ইহুদি সভ্যতার ওপর গভীরভাবে ছাপ ফেলেছিল। সেই সভ্যতার নাম মিশরীয় সভ্যতা যা আজ থেকে প্রায় সাত হাজার বছর আগেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম শিখরে উন্নতি হয়েছিল।

হিব্রুরা হলেন সেমিটীয় জাতির একটি শাখা আরামীয় উপজাতির অন্তর্ভুক্ত। এরাই পরবর্তীকালে ইহুদি বা জু (Jew) নামে পরিচিত হন। কেউ বলেন 'হিব্রু' শব্দটি 'Even' শব্দ থেকে অর্থাৎ গোষ্ঠীপতি আব্রাহামের 'অবার' নাম 'আব্রি' থেকে উদ্ভূত। 'কোনান' শব্দটি এসেছে সেমিটীয় 'কিনাখখী' (Kinakhkhi) শব্দটি থেকে যার অর্থ 'রক্তিম পশমের ব্যবসায়ী'। কোনানই পরবর্তীকালে প্যালেস্টাইন নামে পরিচিত হয়। এর অন্তর্গত ছিল ফিনিশিয়া (Phienicia)। মূল গ্রিক শব্দ 'Phoenike', যার অর্থ 'লাল পশমের দেশ'। বোঝা যায় পশুপালন এ অঞ্চলের এক প্রধান জীবিকা ছিল। ১৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্যালেস্টাইন নামটি পাওয়া যায়।

'মনোথিইজম' অর্থাৎ একেশ্বরবাদ বাইবেলের তথা ইহুদি ধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রথা। একেশ্বরবাদী ধর্মগুলির মধ্যে ইহুদি ধর্ম প্রাচীনতম। তৎকালে অসংখ্য ইহুদি, মিশরে নানা কাজে বিশেষত ক্রীতদাস হিসাবে ছিলেন। ১২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি তাঁরা মোজেসের নেতৃত্বে সে দেশ পরিত্যাগ করেন। এর আগে ইহুদিরা যে বহু ঈশ্বরের বা দেবদেবীর কিংবা এক ঈশ্বরের বহুরূপের প্রকাশে বিশ্বাস করতেন, তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টের বহু স্থানে। এই একেশ্বরবাদিত্ব মূল বাইবেলের চরিত্রের অনেকটাই বদল ঘটিয়েছে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। তার নিদর্শন বাইবেলে বর্ণিত লোক পুরাণগুলি বিশ্লেষণ করলেই পাওয়া যায়।

বাইবেলের 'ওল্ড টেস্টামেন্টের' 'আদিপুস্তক' (Genesis) সৃষ্টি বিষয়ে দুটি সম্পূর্ণ পৃথক বিবরণ পাওয়া যায়। এর মধ্যে যেটি প্রাচীনতর 'ইয়াওয়ে এলোহিম' পন্থীদের সৃষ্টি। সেটি পাওয়া যায় 'আদি পুস্তকের' দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ৪র্থ-২৫তম পদ পর্যন্ত। পরবর্তীকালে পুরোহিতদের দ্বারা সৃষ্ট লোকপুরাণটি আছে প্রথম

পরিচ্ছেদ (সম্পূর্ণ) এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের তৃতীয় পদ পর্যন্ত। প্রাচীনতরটিতে দেখি স্রষ্টার নাম 'ইয়াওয়ে'। পরবর্তীকালে সংস্কারকদের হাতে হয়েছেন 'ইয়াওয়ে ইলোহিম'। কারণ তাঁদের রচনায় স্রষ্টার নাম 'এলোহিম'। উভয় কাহিনির একটি তুলনামূলক সারণি (ক্রম অনুযায়ী) দেখা যেতে পারে —

এলোহিমের সৃষ্টি	ইয়াওয়ে ইলোহিমের সৃষ্টি
১। আলো	১। পৃথিবী
২। স্বর্গ	২। স্বর্গ
৩। পৃথিবী	৩। কুয়াশা
৪। ভূমি	৪। নর
৫। তৃণ ও বৃক্ষ	৫। গাছপালা
৬। জ্যোতিষ্কমণ্ডলী	৬। নদী
৭। সামুদ্রিক প্রাণী	৭। পশু ও সরীসৃপ
৮। পাখি	৮। পাখি
৯। পশু ও সরীসৃপ	৯। নারী
১০। নর ও নারী	১০। —

সৃষ্টি রহস্য নিয়ে মূল দুটি কাহিনি ছাড়াও বাইবেলে আরও কয়েকটি কাহিনি, বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে। যা বিভিন্ন মহাদেশের বিভিন্ন জাতি, উপজাতিদের মধ্যে প্রচলিত। সাধারণভাবে পারস্পরিক সম্পর্করহিত হয়েও এই কাহিনিগুলির নিজেদের মধ্যেও বাইবেলের কাহিনির সঙ্গে কিছু মিল আছে, বিশেষত মানবসৃষ্টির উপাদান বিষয়ে। দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন মহাদেশেই মাটির তৈরি আদি মানবের প্রাণের সঞ্চার হয়েছে নাকে ফুঁ দিয়ে। বহু দেশে আবার শুধু মাটি নয় লাল মাটি। রক্তের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, হিব্রুতে লাল রঙকে বলা হয় 'আদোম'।

প্রাচীন লোককথায় মানবের দীর্ঘজীবনের কথা আছে। আমাদের দেশের পুরাণে ও মহাকাব্যে তো বটেই। বাইবেলের নিম্নলিখিত বংশ তালিকাটিও উল্লেখযোগ্য —

আদম – ৯৩০ বৎসর জীবিত ছিলেন।

সেথ – ৯১২ বৎসর জীবিত ছিলেন।

এনোষ – ৯০৫ বৎসর জীবিত ছিলেন।

কেইনান – ৯১০ বৎসর জীবিত ছিলেন।

মহলালীল – ৮৯৫ বৎসর জীবিত ছিলেন।

জারেদ – ৯৬২ বৎসর জীবিত ছিলেন।

এনোখ – ৩৬৫ বৎসর জীবিত ছিলেন।

মেথুসেলাহ্ - ৯৬৯ বৎসর জীবিত ছিলেন।

লামোখ – ৭৭৭ বৎসর জীবিত ছিলেন।

নোয়া – ৯৫০ বৎসর জীবিত ছিলেন।

লোকপুরাণের হিসাবে ব্যাবিলনের রাজাদের রাজত্বকালই এঁদের শতগুণ। যেমন —আলুলিম —২৮,৮০০ বৎসর, আলামার —৩৬,০০০ বৎসর, এনমেনলুয়ান্না —৪৩,২০০, দ্বিতীয় এনমেনলুয়ান্না —২৮,৮০০ বৎসর, ডুমুজি বা তম্মুজ — ৩৬,০০০ বৎসর। স্পষ্টতই পুরোহিতেরা ব্যাবিলনের গল্পে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। আরেকটি তথ্য লক্ষ করার মতো। উপরিলিখিত বংশ তালিকায় আদমের পুত্র সেথ। কেইনান সেথ-এর নাতি। আবার এনোখ সেথ-এর প্রপৌত্র। কেইনানের পিতা এনোষ, হিব্রুতে যার অর্থ মানুষ অর্থাৎ 'আদোম'।

বাইবেলে বিখ্যাত 'ব্যাবেলের স্তম্ভের' গল্পটি উল্লেখযোগ্য। কী করে বিভিন্ন ভাষায় সৃষ্টি হল বা কেন নানা দিকে মানুষ ছড়িয়ে পড়ল, তারই বিবরণ এই 'ব্যাবেলের স্তম্ভের' কাহিনি। বাইবেলের আদিপুস্তকে একাদশ পরিচ্ছেদে আছে। সমস্ত ব্যাপারটিকে ইহুদিরা তাঁদের ধর্মীয় দর্শন অনুযায়ী সাজিয়ে দিয়েছেন। ঈশ্বর অর্থাৎ ইরাওয়ে সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান। মানুষের বিদ্রোহ দমন করতে তাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। তাই আদম-ইভের পতন, মহাপ্লাবন এবং 'ব্যাবেলের স্তম্ভের' ঘটনা। বাইবেলে প্লাবনের যে কাহিনি আছে। তাঁর নায়ক নোয়া আদমের নবম বংশধর লামোখ-এর পুত্র। ঈশ্বর নোয়াকে আশীর্বাদ করলেন, খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। ঈশ্বরের সঙ্গে যে চুক্তির কথা বারবার বাইবেলে বলা হয়েছে, তা প্রথম হল নোয়ার সঙ্গে এবং এর প্রমাণ স্বরূপ ঈশ্বর মেঘের মধ্যে রামধনুর সৃষ্টি করলেন। ব্যাবিলনের গল্পে কিন্তু এই রামধনুর কথা নেই। অবশ্য তাঁদের বিশ্বাসে এ ধরনের চুক্তির কথাও ছিল না। মেসোপটেমিয়ায় লোকবিশ্বাসে রামধনুকে ধনুক বলে মনে করা হয় না, বলা হয় অর্ধ অঙ্গুরীয় (মার রাত)। ব্যাবিলনের গল্পে বরং একটি সোয়ালো পাখির কথা আছে। কাহিনি যে ভাবেই আসুক, দুটো জিনিস লক্ষ করার মতো। প্রথমত কাহিনিটি ব্যাবিলনীয় কাহিনি থেকে নেওয়া। আবার মূল গল্প আগেই নেওয়া হয়েছিল হয়ত ইহুদিদের আদি বাসস্থান থেকে আর পরবর্তীকালে সৃষ্টি কাহিনির মতো এলেও, পুরোহিতদের হাত পড়েছে, যাঁরা পুরোপুরি একেশ্বরবাদী। এস. এইচ. হুক তাঁর 'মিডল ইস্টার্ন মিথোলজি' গ্রন্থে সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয় ও বাইবেলের এই কাহিনিগুলির একটি তুলনামূলক চিত্র দিয়েছেন —

সুমেরীয় কাহিনি	ব্যাবিলনীয় কাহিনি	ইরাওয়ে পন্থীদের কাহিনি	পুরোহিতদের সৃষ্ট কাহিনি
বড্ড গোলমাল করছে, এই অজুহাতে এনলিল মানবজাতি ধ্বংসের আদেশ দিলেন।	ঈশ্বর প্লাবনের আদেশ দিলেন।	পাপের কারণে ইয়াওয়ে মানব জাতির ধ্বংসের আদেশ দিলেন।	এলোহিম ওই একই কারণে সকল জীবিত প্রাণী ধ্বংস করতে চাইলেন।
প্লাবনের নায়ক জিউসুদ্রা।	নায়ক উৎনাপিস্তিম।	নায়ক নোয়া।	নায়ক নোয়া।
জিউসুদ্রার জাহাজ বিশাল।	জাহাজটি ঘনক্ষেত্র একেক দিকে ১২০ হাত, ৬/৭ তলা, ৯টি ভাগ।	-	আর্ক বা জাহাজ ৩০০ হাত /৫০ হাত /৩০ হাত, তিনতলা।
-	সঙ্গে সকল প্রকার প্রাণী।	সাত জোড়া শুদ্ধ ও দুটি করে অশুচি প্রাণী। ইয়াওয়ে নোয়াকে ভেতরে বন্ধ করলেন।	প্রতি প্রাণী একজোড়া করে।
প্লাবন চলল সাতদিন ধরে।	প্লাবনের কাল ছয় দিন।	চল্লিশ দিন ধরে বন্যা তারপর জল শুকোতে আরও ১৪ দিন।	বন্যা ১৫০ দিন, জল শুকোতে ১৫০ দিন।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিভিন্নকালে জল প্লাবনে পৃথিবী তথা মানবজাতি ধ্বংসের কাহিনি প্রচলিত আছে। ভারতীয় পুরাণেও প্লাবনের গল্প আছে। অসংখ্য লোককাহিনি বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। যেমন- সোডোম ও গোমরাহ্ নগর দুটি ধ্বংসের। কাহিনি, মোজেসের জন্মকথা, ইহুদিদের মিশর ত্যাগ নিয়ে কাহিনি, বিখ্যাত আর্ক-সংক্রান্ত কাহিনি ইত্যাদি। নির্বাসনোত্তর কালের পুরোহিতেরা যতই পরিমার্জন, পরিবর্তন করুন না কেন, কাহিনিগুলি বাইবেল থেকে আলাদা করা যায়নি। কতটা কোন জাতি থেকে নেওয়া, কতটাই বা পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়েছে বোঝা দুষ্কর। যদিও তৎকালের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস, লোককাহিনি, ইতিহাসের চিত্র একমাত্র বাইবেলের মাধ্যমেই আমাদের কাছে সবচেয়ে সঠিকভাবে আমাদের কাল আবধি পৌঁছেছে।

ওল্ড টেস্টামেন্টের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

'ওল্ড টেস্টামেন্টের' বাংলা করা হয়েছে পুরাতন নিয়ম। পৃথিবী সৃষ্টির থেকে শুরু করে যিশু খ্রিস্টের জন্মের ৪০০ বছর আগে পর্যন্ত মানবজাতির ও ঈশ্বরের চুক্তির প্রাচীনতম বিবরণ। যদিও বাইবেলের এই অংশ প্রধানত ইহুদি জাতির সঙ্গে

সম্পর্কিত তথাপি তা সর্বকালের সকলের জন্য প্রযোজ্য হয়েছে। ঐতিহাসিক বিষয়, ভবিষ্যৎবাণী, ডেভিডের গীতি কবিতা প্রভৃতি অনন্তকালীন মূল্য বিদ্যমান ও সেগুলি অন্যান্য সকল পাঠ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ওল্ড টেস্টামেন্টে মোট ৩৯টি গ্রন্থ আছে। যথাক্রমে —

(ক) মোশির পঞ্চপুস্তক

ওল্ড টেস্টামেন্টের প্রথম পাঁচটি পুস্তক আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ শতকে মোশির দ্বারা লিখিত হয়েছিল। এইগুলিকে মোশির পঞ্চপুস্তক বা ব্যবস্থা পুস্তক বলা হয়।

১) আদিপুস্তক = বাইবেলের উৎপত্তি বা আরম্ভের পুস্তক (সৃষ্টি, পাপ, মানবজাতি, ঈশ্বরের প্রজা)।

২) যাত্রা পুস্তক = ঈশ্বর তার প্রজাদের মিশর দেশ থেকে উদ্ধার করে তাদের নিয়ম দান করেন।

৩) লেবীয় পুস্তক = শুদ্ধতায় যাজ্ঞিক নিয়ম, বলিদান ও শোধনের ধর্মীয় নিয়ম, বলিদান ও উপাসনা। এই পুস্তকের ধর্মীয় রীতিনীতি আলংকারিক ভাবে শিক্ষা দেয়। কীভাবে একজন পাপী পাপ পরিত্যাগ করে পবিত্র আত্মার সহভাগিতায় পূর্ণ মিলিত হতে পারে।

৪) গণনাপুস্তক = ঈশ্বরের লোকদের ক্রমাগত অবাধ্যতা ৪০ বছর প্রান্তরে ভ্রমণ ও প্রান্তরে অবস্থান।

৫) দ্বিতীয় বিবরণ = মোশির গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যসমূহ। মনোনীত ব্যক্তিদের প্রতিজ্ঞাত ভূমিতে প্রবেশের প্রস্তুতি।

(খ) ঐতিহাসিক পুস্তক

পরবর্তী ১২টি পুস্তক হচ্ছে ঐতিহাসিক পুস্তক। খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০-৪০০ অব্দের মধ্যে লেখা। ঐতিহাসিক পুস্তকের অন্ধকারময় পৃষ্ঠাগুলিতে পাপের গুরুত্ব ঈশ্বরের বিচার এবং পরিত্রাণের ঐকান্তিক প্রয়োজনীয়তার বর্ণনা রয়েছে। কুলপতিদের জীবনচরিত, ইহুদি জনজীবনের মধ্যে ইতিহাসের অধিকর্তা রূপে ঈশ্বরের প্রকাশ এবং সর্বকালের সংগ্রামের মধ্যে বিশ্বাসীবর্গের বিজয় বর্ণনা, এই পুস্তকগুলির বিষয়বস্তু।

(৬/১) যিহোশূয় = মোশির মৃত্যুর পর প্রতিজ্ঞাত ভূমিতে ইহুদিদের প্রবেশ। যিহোশূয় তাদের নিয়ে জর্দন পার করে কোনান দেশ জয় করেন ও দ্বাদশ বংশের মধ্যে কোনান দেশ ভাগ করে দেন।

(৭/২) বিচারকর্তৃগণের বিবরণ = প্রতিজ্ঞাত ভূমিতে প্রথম ৩০০ বছর। পবিত্র ভূমিতে বিশৃঙ্খলা। লোকদের যা ভালো বলে মনে হত, তাই তারা করতে লাগল। ঈশ্বর ইহুদি জাতিকে উদ্ধারের জন্য, বার বার বিচারকর্তৃগণকে পাঠালেন। তাদের মধ্যে গিদিয়োণ, শিমসন প্রভৃতি ১২ জন ছিলেন।

(৮/৩) রূতের বিবরণ = রূৎ দায়ুদের প্র-মাতামহী। জগতে ত্রাণকর্তার আগমনের ক্ষেত্র হিসেবে মূল পরিবারের ভিত্তিস্থাপক।

পরবর্তী ৬টি পুস্তক-৯/৪ ১ম শমূয়েল, ১০/৫ ২য় শমূয়েল, ১১/৬ ১ম রাজাবলি, ১২/৭ ২য় রাজাবলি, ১৩/৮ ১ম বংশাবলি, ১৪/৯ ২য় বংশাবলি। এই ৬টি পুস্তক থেকে আমরা প্রায় ৫০০ বছরের ইতিহাস জানতে পারি। বিচারকর্তৃগণের মধ্যে শেষ ব্যক্তি হচ্ছেন শমূয়েল যিনি শৌলকে খ্রিস্টপূর্ব একাদশ শতকে অভিষেক দান করেন। শৌলের পর দায়ুদ আসেন আনুমানিক ১০১০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এবং তারপর শালোমন ৯৭৪ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে। এরপর দেশ দু-ভাগ হয়ে যায়। একভাগের নাম যিহুদা ও অপর ভাগের নাম ইস্রায়েল। ক্রমান্বয়ে তারা অশুর ও বাবিলের কাছে পরাজিত হয়। খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকে ইস্রায়েল ও যিহুদার অধিবাসীরা বন্দি হয়।

১৫/১০ ইস্রা = যিনি জেরুশালেমের ধর্মমন্দির পুনঃনির্মাণ করেন।

১৬/১১ নহিমীয় = যিনি জেরুশালেম নগর পুনঃনির্মাণ করেন।

এই দুটি পুস্তকে জাতির বন্দিত্ব থেকে প্রত্যাবর্তনের কথা জানা যায়।

১৭/১২ ইষ্টের = বন্দি রানির ঘটনা, যা থেকে বন্দিদশার এক বিশেষ ঘটনার কথা আমরা জানতে পারি। বন্দিত্বকালের স্থায়িত্ব ৭০ বছর। ৫৩৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পারস্যরাজ কোরসের সময়ে এই বন্দিত্বের অবসান হয়। এরপর যিশুখ্রিস্টের জন্মকাল পর্যন্ত বাইবেলের আর কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায় না। ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউ টেস্টামেন্টের মধ্যে ৪০০ বছরের এক বিরামকাল ইতিহাসের এক নিস্তব্ধ সময় দেখতে পাওয়া যায়।

(গ) কাব্যিক পুস্তকাবলি

পরবর্তী পাঁচটি পুস্তক ঈশ্বরের মহত্ত্ব এবং মানবজাতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গানে ও কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। এইগুলির মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের ভক্তদের শ্রদ্ধা, প্রার্থনা, প্রলোভন, সহভাগিতা প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছে। এই পুস্তকগুলির সময়কাল বিন্যাস ছাড়াই উপস্থাপিত হয়েছে।

(১৮/১) ইয়োব = ঈশ্বরকে ভালোবাসে এমন একজন মানুষের যন্ত্রণা ও প্রেম নিষ্ঠ আনুগত্যের মহাকাব্য।

(১৯/২) গীতসংহিতা = প্রশংসা ও প্রার্থনা গীতি। ইস্রায়েলের রাজা মহান গায়ক দায়ুদের ও অন্যান্য কিছু ভক্তের চমৎকার স্তোত্র ভজন সংকলন।

(২০/৩) হিতোপদেশ = যে সকল বাস্তব জ্ঞান ঈশ্বর আশীর্বাদপ্রাপ্ত জীবনে দিয়ে থাকেন। হিতোপদেশের অধিকাংশই রাজা শলোমনের লেখা। এর বেশির ভাগই হিষ্কীয়ের সংগ্রহ এবং সাধারণভাবে তা যুবদের উদ্দেশ্যেই লেখা।

(২১/৪) উপদেশক = এই পুস্তকে পার্থিব দ্রব্যের অসারত্ব এবং ঈশ্বরবিহীন জীবনের শূন্যতা দেখানো হয়েছে।

(২২/৫) পরমগীত = এই গীতে তার প্রিয় মানুষের প্রতি ঈশ্বরের প্রেমের প্রকাশ। এই ভালোবাসার পূর্ণতা দেখা যায়, মণ্ডলীর প্রতি খ্রিস্টের ভালোবাসার মধ্য দিয়ে।

(ঘ) নবীদের পুস্তকাবলি

১৭টি পুস্তক নবীদের লেখা নিয়ে সংকলিত এবং পুস্তকগুলি নবীদের নাম অনুসারে পরিচিত। নবী হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যাঁকে ঈশ্বর মানবজাতির কাছে বার্তাবাহকরূপে পাঠান। এই পুস্তকগুলির আকার অনুসারে পুস্তকগুলিকে বৃহৎ নবীদের পুস্তক ও ক্ষুদ্র নবীদের পুস্তক বলা হয়।

৫টি বৃহৎ নবী পুস্তক

(২৩/১) যিশাইয় – মোশীহ বিষয়ক ভাববাদী বলা হয়। এই পুস্তকে মোশীহ অর্থাৎ খ্রিস্টের আগমন বিষয়ে বিস্তর ভবিষ্যৎবাণী আছে। যিশাইয়ের পুস্তককে কেউ কেউ 'পঞ্চম সুসমাচার' বলেন। ৫৩ অধ্যায়ে নবী, খ্রিস্টের ত্রাণকারী মৃত্যুর স্পষ্ট বর্ণনা দেয়।

(২৪/২) যিরমিয় = তিনি যিশাইয়ের পরবর্তী প্রায় ১০০ বছর জীবিত ছিলেন। ৫৯৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দের জেরুশালেমের পতনের পূর্বে, তিনিই ছিলেন ঈশ্বরের শেষ বার্তা বাহক।

(২৫/৩) বিলাপ = যিরমিয়ের দ্বিতীয় পুস্তকের নাম বিলাপ। জেরুশালেমের দুর্ভাগ্য ও যন্ত্রণা, নির্যাতিত মানুষের খেদোক্তি।

(২৬/৪) যিহিষ্কেল = বন্দিত্বকালের নবী। ৫৯০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ব্যাবিলনে নির্বাসিত হন।

(২৭/৫) দানিয়েল = যৌবনে ব্যাবিলনে নির্বাসিত হয়ে, বন্দিত্বের সমস্ত জীবন ধরে সাংবাদিক ও ভাববাদীরূপে কাজ করেছেন।

১২টি ক্ষুদ্র নবী পুস্তক

(২৮/১) হোশেয়, (২৯/২) যোয়েল, (৩০/৩) আমোষ, (৩১/৪) অবদীয়, (৩২/৫) যোনা, (৩৩/৬) মীখা, (৩৪/৭) নহূম, (৩৫/৮) হবককূক, (৩৬/৯) সফনীয়, (৩৭/১০) হগয়, (৩৮/১১) সখরীয়, (৩৯/১২) মালাখী।

নবীদের পুস্তকাবলি ঈশ্বরের অনন্তকালীয় পরিকল্পনায় ক্রমবিকাশ জ্ঞাত করায় এবং সাধারণভাবে ইস্রায়েল জাতি ও জগতের ত্রাণকর্তারূপে খ্রিস্টের দুঃখভোগ ও মৃত্যু বিজয়ের বর্ণনা দেয়।

নিউ টেস্টামেন্টের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

'নিউ টেস্টামেন্ট' বাইবেলের দ্বিতীয় খণ্ড। ওল্ড টেস্টামেন্টের পরিপূর্ণতার বিবরণ। এই নিউ টেস্টামেন্টই মানবত্রাতা যিশুখ্রিস্টের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। ঈশ্বরের ও মানুষের মধ্যে প্রকৃত চুক্তি। এই অংশে আমরা যিশুখ্রিস্টের জীবন; খ্রিস্টীয় ধর্মের

আরম্ভ, পরিত্রাণের উপায়, খ্রিস্টীয় জীবন পথের শিক্ষা ও ভবিষ্যতের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা দেখতে পাই। এই অংশে মোট ২৭টি পুস্তক আছে।

৪টি সুসমাচার

এই পুস্তকগুলি যিশুখ্রিস্টের জন্ম, জীবন, মৃত্যু, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণের বিবরণ দেয়। এই চারটি পুস্তকের বর্ণনায় ঈশ্বরে প্রেম, পাপে পূর্ণ, পথহারা মানুষকে উদ্ধার করতে যিশুখ্রিস্টকে জগতে পাঠালেন। এই ৪টি পুস্তকের বর্ণনায় নাসরতীয় যিশুর কাহিনি বলা হয়েছে। মথি, মার্ক, লুক এবং যোহন, চারজন সুসমাচার প্রচারকের বর্ণনাই এই একই প্রকার। প্রতিজনই যিশু খ্রিস্টের ব্যক্তি জীবনের একটি প্রতিচ্ছবি আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন।

১। মথি – যিশু খ্রিস্টের জীবনের মধ্যে নবীদের দ্বারা ঘোষিত বহু প্রত্যাশিত ত্রাণকর্তা ও রাজা মশীহকে দেখিয়েছেন।

২। মার্ক – যিশু খ্রিস্টের জীবনে এক মহান পরিচারককে দেখিয়েছেন। যিনি পরিচর্যা পেতে নয় কিন্তু পরিচর্যা করার মধ্য দিয়ে তাঁর পরাক্রমযুক্ত কাজ সম্পন্ন করেছেন।

৩। লুক – যিশুর জীবনের মধ্যে এক প্রকৃত মানবকে দেখিয়েছেন, যিনি তাঁর মানবতার ওপর জোর দিয়েছেন।

৪। যোহন – যিশুর জীবনে ঈশ্বরের পুত্রত্ব আরোপ করেছেন, তিনি তাঁর স্বর্গীয় সত্তার ওপর জোর দিয়েছেন। এই চারটি পুস্তককেই বলা হয় সুসমাচার।

শিষ্যদের কার্যবিবরণ

এই পুস্তক 'পঞ্চাশত্তমি'তে পবিত্র আত্মার দান প্রাপ্তির পর সুসমাচারের প্রথম বিজয়ের ঐতিহাসিক বর্ণনা। এই পুস্তকের প্রথম ভাগে ইহুদিদের প্রেরিত সাধু পিতরের খ্রিস্টধর্মের প্রচারের কাহিনি। দ্বিতীয় ভাগে অ-ইহুদিদের কাছে খ্রিস্টধর্মের প্রচারক সাধু পৌলের কাজের বিবরণ। খ্রিস্টের বাণী প্রচারের ফলে এক নতুন খ্রিস্টীয় জনসমাজ গড়ে উঠেছে। যারা যিশু খ্রিস্টকে মুক্তিদাতা রূপে স্বীকার করেছে।

পত্রাবলি (১৩ + ৮)

পরবর্তী ২১টি ক্ষুদ্র পুস্তক হচ্ছে এই পত্রাবলী। এগুলি মণ্ডলী বা সাধারণভাবে খ্রিস্টবিশ্বাসীকে উদ্দেশ করে লেখা। এই পত্রগুলি খ্রিস্টানের দায়িত্ব ও বিশ্বাস সম্পর্কিত বিষয়ে বক্তব্য রাখে। খ্রিস্টধর্মতত্ত্ব ও চিরকালীন সত্যের ব্যাখ্যা দেয়। খ্রিস্টীয় জীবনে অগ্রগতির জন্য দৈনন্দিন জীবনে বাইবেলের শিক্ষার অভ্যাস প্রভৃতি এই পত্রাবলিতে পাওয়া যায়। ২১টি পত্রের মধ্যে ১৩টি পত্রই সাধু পৌলের লেখা। যথাক্রমে —৬/১ রোমীয়দের প্রতি পত্র, ৭/২ করিন্থীয়দের প্রতি ১ম পত্র, ৮/৩ করিন্থীয়দের প্রতি ২য় পত্র, ৯/৪ গালাতীয়দের প্রতি পত্র, ১০/৫ ইফিষীয়দের প্রতি পত্র, ১১/৬ ফিলিপীয়দের প্রতি পত্র, ১২/৭ কলসীয়দের প্রতি পত্র, ১৩/৮

থিষলনীকীয়দের প্রতি ১ম পত্র, ১৪/৯ থিষলনীকীয়দের প্রতি ২য় পত্র, ১৫/১০ তিমথীয়দের প্রতি ১ম পত্র, ১৬/১১ তিমথীয়দের প্রতি ২য় পত্র, ১৭/১২ তীতদের প্রতি পত্র, ১৮/১৩ ফিলিমণদের প্রতি পত্র।

আরও ৮টি অন্যান্যদের পত্র

১৯/১ ইব্রীয়দের প্রতি পত্র (লেখক অজ্ঞাত), ২০/২ সাধু পিতরের ১ম পত্র, (২১/৩) সাধু পিতরের ২য় পত্র (২২/৪) সাধু যাকোবের পত্র, (২৩/৫) সাধু যোহনের ১ম পত্র, (২৪/৬) সাধু যোহনের ২য় পত্র, (২৫/৭) সাধু যোহনের ৩য় পত্র, (২৬/৮) সাধু যিহুদার পত্র

২৭ প্রত্যাদেশ

শেষ পুস্তকখানি, প্রেরিত সাধু যোহনের লেখা। যখন তিনি এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের পাটম দ্বীপে বন্দি ছিলেন, সেই সময়ে লিখেছিলেন। এটা সাধু যোহনের কাছে যিশু খ্রিস্টের দর্শন যা 'প্রকাশিত বাক্য' নামে পরিচিত। সমস্ত পুস্তকটি একটি অনাগত ভবিষ্যৎ দিনের দর্শনের বিবরণ। পৃথিবী শেষ হবার আগে কি কি ঘটতে চলেছে তার ভবিষ্যৎ বাণী। যিশু খ্রিস্টের শয়তানের ওপর শেষ বিজয়। বিশ্বাসী-অবিশ্বাসীদের অবস্থার ছবিও তুলে ধরা হয়েছে।

বাইবেলের প্রায় সমস্ত পুস্তকই অধ্যায় ও পদে ভাগ করা হয়েছে। সেন্ট অগাস্টিন বাইবেলের দুটি অংশ সম্বন্ধে বলেন, **"ওল্ড টেস্টামেন্টের মধ্যে নিউ টেস্টামেন্ট লুকিয়ে আছে, আর নিউ টেস্টামেন্টে, ওল্ড টেস্টামেন্ট প্রকাশিত হয়েছে।"**

বাইবেলের বঙ্গানুবাদ প্রসঙ্গ : কেরীর পূর্বসূরী জন টমাস এবং কেরী

অষ্টাদশ শতকের সূচনায় – ভারতীয় ভাষায় বাইবেল অনুবাদের সূচনা হয়েছিল। পরিব্রাজক ক্লডিয়াস বুকানন ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে সিরীয় ভাষায় বাইবেলের সন্ধান পেয়েছিলেন। বাইবেলের অনুবাদের গুরুত্ব, এ বিষয়ে সচেতনতা এবং উদ্যম প্রকৃতপক্ষে প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারিদের উদ্যোগেই সংহত হয়েছিল। এঁদের অনেক আগেই অবশ্য রোমান ক্যাথলিক মিশনারিরা ভারতবর্ষে খ্রিস্টবানী প্রচার করতে এসেছিলেন। তবে তাঁরা বাইবেল অনুবাদের কথা ভাবেননি।

প্রোটেস্ট্যান্ট ডাচ্ মিশনারিদের মধ্যে প্রথম ভারতে এসেছিলেন বার্থলোমিউ জাইগনবল্গ। তিনি বাইবেলের তামিল অনুবাদ করেন। ভারতীয় ভাষায় প্রথম বাইবেল ছিল এই তামিল বাইবেল। ১৭১৪ খ্রিষ্টাব্দে মিশনারি জাইগনবল্গ প্রথমে নিউ টেস্টামেন্টের অনুবাদ প্রকাশ করেন। কাজেই মিশনারি উইলিয়াম কেরী (১৭৬১ – ১৮৩৪) ভারতবর্ষে আসার আগেই, দেশীয় ভাষায় বাইবেল অনুবাদের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের পরে বাইবেল অনুবাদের পরবর্তী পর্ব – দক্ষিণ ভারত থেকে পূর্বভারত তথা বঙ্গদেশেই ব্যাপক ভাবে শুরু হয়। মিশনারি কেরীর

অক্লান্ত উদ্যম এবং অধ্যবসায়েই সমগ্র ভারতসহ বহির্ভারতে বাইবেলের প্রচার ঘটে।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বাংলা গদ্যের সেরকম পূর্ণাঙ্গ কোনো গ্রন্থ ছিল না। উনিশ শতকের সূচনাতেই বাংলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ তাই এক বিরাট বিস্ময়। মধ্যযুগের পদ্য-কাব্য নির্ভর বাংলা সাহিত্যের ভিড়ে বাংলা গদ্যে বাইবেল অনুবাদ এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটালো। বেদ-পুরাণ-মহাকাব্য কাহিনির গতানুগতিক দেশীয় বিষয় ছেড়ে, বাইবেলের বিষয় বাঙালিকে চমকে দিল। একঘেয়ে ছন্দোবদ্ধ পয়ারের পদ্য ছেড়ে গদ্যকে সাহিত্যের বাহন হিসাবে স্বাগত জানানো হলো। বাংলা গদ্যে বাইবেল — এই দুঃসাহসী পদক্ষেপের জন্য ইংরেজ ধর্মযাজকদের ভূমিকা অবিস্মরনীয়। বাংলায় বাইবেল চর্চায় প্রাথমিক পর্বে চেম্বার্সের পরিকল্পনা, জন টমাসের উদ্যম আর সর্বোপরি 'শ্রীরামপুর ত্রয়ী'র অনন্য অবদান চিরস্মরণীয়। বাংলায় বাইবেলের ক্ষেত্রে মিশনারি কেরীর প্রথম সহযোগী মিশনারি জন টমাস। যদিও মিশনারি টমাস কেরীর আগে তিনবার বঙ্গদেশে এসেছিলেন। মিশনারি জন টমাসই, উইলিয়াম কেরীকে বঙ্গদেশে আসার জন্য অনুপ্রাণিত করেন।

মিশনারি জন টমাস (১৭৫৭-১৮০১) জাহাজে ডাক্তারের চাকরীতে যোগ দিয়ে - ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ভারতে আসেন। ১৭৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি জাহাজের ডাক্তারি ছেড়ে বঙ্গদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য মিশনারি ব্রতে দীক্ষিত হন। ইংরেজ ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান পদকর্তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করেন - মিশনারি জন টমাস। এখানে মনে রাখতে হবে - উইলিয়াম কেরী ভারতে আসার (১৭৯৩) দশ বছর আগে ডাক্তার জন ভারতে আসেন। সেই সময় উইলিয়াম চেম্বার্স সুপ্রিম কোর্টের ফারসি দোভাষী ছিলেন। ফারসি ভাষায় চেম্বার্সের অসাধারণ দক্ষতা ছিল। দোভাষী চেম্বার্স ফারসি ভাষায় - বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট অনুবাদ করার কথা ভাবছিলেন; ঠিক সেই সময় মিশনারি জন টমাসের সংযোগ হয়। উইলিয়াম চেম্বার্সের মুন্সি ছিলেন, বাংলা গদ্যের লেখক রামরাম বসু। চেম্বার্স, টমাস ও রামরাম বসুর যৌথ প্রয়াসে - দীর্ঘ ৭ বছরের প্রচেষ্টায় নিউ টেস্টামেন্টের সেন্ট ম্যাথু অনূদিত হয়েছিল।

প্রাচ্যবিদ উইলিয়াম জোন্স, মিশনারি জন টমাসকে উৎসাহিত করেছিলেন। বিশেষ উৎসাহ দিয়ে, বাংলা ভাষায় বাইবেল মুদ্রিত হলে, ৪৮০ টাকায় ৩০ কপি বাংলা বাইবেলের গ্রাহক যোগাড় হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিশনারি জন টমাসের স্বপ্ন সফল হয়নি। বিফল হয়ে মিশনারি টমাস ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে ফিরে যান। কিন্তু ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ১৩ জন মিশনারি (কেরী সহ) নিয়ে তিনি ভারতের জাহাজে শেষবারের মতো প্রবাস যাত্রা করেছিলেন। সমুদ্রের নোনা জলের উপর - জাহাজে বসেই, মিশনারি টমাসকে, কেরী সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছিলেন। বাংলাভাষায় বাইবেল অনুবাদে, কেরীর সঙ্গে টমাস অক্লান্ত শ্রমস্বীকার করেন। অবশেষে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে ১১ নভেম্বর মিশনারি টমাস ও মিশনারি উইলিয়াম কেরী সপরিবারে

কলকাতায় আসেন। মিশনারি জন টমাসের আরব্ধ কাজ, মিশনারি উইলিয়াম কেরী নিজের কাঁধে নিলেন। ১৭৯৩ – ১৮০১ খ্রিস্টাব্দের ১৩ অক্টোবর দিনাজপুরে মৃত্যু পর্যন্ত মিশনারি টমাস, কেরীর ছায়াসঙ্গী ছিলেন। দিনাজপুরেই বাংলা বাইবেলের প্রথম অনুবাদক জন টমাস (১৭৫৭-১৮০১) – এর সমাধি আছে।

জন টমাসের বাংলা অনুবাদকে কেরী সংশোধন করে নিয়েছিলেন। বাংলায় বাইবেল নিয়ে ডাক্তার জন টমাসের উৎসাহ ছিল অপরিমিত। ডাক্তারি ছেড়ে দিয়ে টমাস নিঃস্ব রিক্ত হয়ে গেছেন, তবুও তিনি কখনও আশা ছাড়েননি। বঙ্গদেশে মিশনারি উইলিয়াম কেরীর আসার জন্য টমাসের প্রস্তাব ও প্রভাব ছিল অব্যর্থ। জন টমাসই আধুনিক কালের প্রথম ইংরেজ মিশনারি যিনি প্রথম বাংলা গদ্যে বাইবেল অনুবাদের সূচনা করেন। অবশ্য তাঁর বাংলা অনুবাদ, কেরীর অনুবাদের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়েছে। বাংলা ভাষা বাইবেল অনুবাদের ইতিহাসে মিশনারি জন টমাসের উদ্যম এবং উদ্যোগ চিরস্মরণীয়। মিশনারি কেরী বাংলা ভাষা শিখেছিলেন, অভিজ্ঞ রামরাম বসুর সহায়তায়। সেই সঙ্গে ছিল, কেরীর লৌকিক সংযোগের 'কথোপকথনে'র (১৮০১) ব্যবহারিক ভাষার আগ্রহ। কিন্তু তা সত্ত্বেও মিশনারি কেরী — অনুবাদের ভাষা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান সন্তোষজনকভাবে পূরণ করতে পারেননি। কেননা নিজের প্রয়োজনের ভাষা কেরী নিজেই তৈরী করে নিয়েছিলেন। বস্তুত তখন পর্যন্ত (১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) বাংলা গদ্যভাষা 'সাহিত্যিক' অস্তিত্ব অর্জন করতে পারেনি। তবে কেরী জীবৎকালে বাংলা বাইবেলের বারবার পরিবর্তিত সংস্করণ করেছিলেন।

১) মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত (১৮০০)

'অতএব তোমরা এই মত প্রার্থনা কর হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ, তোমার নাম পুণ্য করিয়া মানা যাউক।'

২) নিউ টেস্টামেন্ট (ধর্মপুস্তক : ১৮০১)

'অতএব এই মত কামনা কর আমাদের পিতা তিনি স্বর্গে পবিত্র হউক।'

৩) নিউ টেস্টামেন্ট (অষ্টম সংস্করণ : ১৮৩২)

'অতএব এই মত প্রার্থনা কর হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা তোমার নাম পবিত্ররূপে মান্য হউক।'

মিশনারি কেরী ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। তাহলে দেখা যাচ্ছে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সংস্করণ পরিবর্তন করে চলেছেন। কেরীর বাংলা বাইবেলের জন্য কলকাতার ইংরেজ মহলে তাঁর খ্যাতি তৈরি হয়। তাই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে গভর্নর জেনারেল ওয়েলেসলি তাঁকে বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদে নিয়োগ করেন। ব্যাপ্টিস্ট্ মিশনারি সোসাইটির নিয়ম ভেঙে কেরী এই অধ্যাপক পদে যোগ দেন। কেরী বাংলা ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করে বাংলা বাইবেলের স্রোতধারা খুলে

দিয়েছেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে এক নতুন বিষয়-কাহিনী সংযোজন করে বৈচিত্র্য এনেছেন তিনি। সেজন্য তিনিই বাংলা বাইবেলের অনন্য কৃত্তিবাস। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে কেরীর বাংলা বাইবেলের গুরুত্ব গদ্যরচনার ফল্গুধারার পথ সৃষ্টি করেছেন। বাংলা ভাষায় কবিতা আছে কিন্তু গদ্য নেই। বাংলা বাইবেল উনিশ শতকে সেই গদ্য ভাষার সৃষ্টিধারার পথকে সুজলা-সুফলা করতে সাহায্য করেছে।

বাংলা বাইবেলের ভাষা

বাংলা ভাষায় বাইবেল চর্চার প্রাথমিক পর্ব বাংলা গদ্যেরও বিকাশপর্ব। বিদেশি খ্রিস্টান মিশনারিদের হাতে সেরকম কোনো বাংলা গদ্য ছিল না। তাই সবটাই ছিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার উন্মেষ-লগ্ন। এই খ্রিস্টান ধর্মযাজকেরা প্রায় সকলেই ছিলেন ইংরেজি-ভাষী। স্বাভাবিকভাবে তাঁদের মাতৃভাষায় ইংরেজির প্রভাব অনিবার্য কারণে এসে পড়বে। বাংলা গদ্য কতখানি সুমধুর হয়েছে সেটা বড়ো নয়। তাঁরা বঙ্গদেশকে ভালোবেসে, বাংলা ভাষাকে অন্তর দিয়ে আজীবন চর্চা করেছেন।

রেভারেন্ড কেরী বাইবেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ 'Baptism' শব্দের অনুবাদে 'ডুবন' ব্যবহার করেছিলেন। 'Baptism' শব্দের অনুবাদে 'ডুবন' শব্দটি আক্ষরিক হয় বটে, কিন্তু খ্রিস্টীয় বিশ্বাসীদের কাছে মূল শব্দটি যে গভীর তাৎপর্য বহন করে, 'ডুবন' শব্দে তার মাধুর্য নষ্ট হয়। বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান সমাজ 'আহ্নিক' বা 'ওজুর' পরিবর্তে অন্য কোনো বিকল্প শব্দই গ্রহণ করতে পারে না। এই শব্দটি এখনও বাইবেলে 'বাপ্তিস্ম' রূপেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

আচার্য সুকুমার সেনের মতে, রেভারেন্ড উইলিয়াম কেরীর জীবৎকালে শেষ সংস্করণ প্রকাশের ছয় বছর পরে ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন থেকে বাংলা ভাষায় রোমান অক্ষরে বাইবেল 'ধর্মপুস্তকের অন্তভাগ' প্রকাশিত হয়। এই বাংলা বাইবেলের ভাষা এমন চমৎকার যে সেকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি লেখকেরাও এর থেকে ভালো বাংলা গদ্য লিখতে পারেনি। এই বাংলা বাইবেলের অনুবাদক ছিলেন — রেভারেন্ড উইলিয়াম ইয়েটস্ (১৭৯২-১৮৪৫)।

রেভারেন্ড ইয়েটসে্র এই সংস্করণের একটি অংশের বাংলা লিপ্যন্তরিত করে দেওয়া হল—

> "জোহান নামে বাপ্তাইজক সেই সময় যিহুদা দেশের প্রান্তরেতে উপস্থিত হইয়া প্রচার করিয়া কহিল, মন ফিরাও কেননা স্বর্গের রাজত্ব সন্নিকট হইল। পরমেশ্বরের পথ প্রস্তুত কর, ও তাঁহার রাজপথ সমান কর। প্রান্তরে এই বাক্যবাদী একজনের রব, এমন কথা জিশাইয় ভবিষ্যদবক্তা দ্বারা অই জোহনর বিষয় কথিত ছিল। জোহনের বস্ত্র উটের লোমজাত ও সে কটিকে চর্ম্মপটুকাবদ্ধ এবং পঙ্গপাল ও

বনমধু খাদ্য ছিল।”

বর্তমান বাংলা গদ্যের এই অসাধারণ রূপায়ণ শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের প্রথমেই। এই রূপায়ণের মূলে বহুল পরিমাণেই ছিল বাঙালির ইংরেজি-সাহিত্য প্রীতি। তবে বাংলায় বাইবেল অনুবাদকে কোনো ভাবেই উপেক্ষা করা যাবে না। ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব শুধু বিষয়বস্তুতেই নিবদ্ধ থাকেনি। বাক্‌বিধির অনেক ছোটো এবং বড়ো রীতি বাংলা গদ্যে প্রবেশ করেছিল। রেভারেন্ড কেরীর জীবদ্দশায় বাংলা বাইবেলের আটটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি প্রায় সব সময়েই সংশোধন ও পরিমার্জনায় নিজেকে নিযুক্ত রেখেছেন। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দের সংস্করণ থেকে ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দের সংস্করণের ভাষা উন্নততর সন্দেহ নেই। এই ভাষা অধিকতর তদ্ভব শব্দ ও মৌখিক রীতির অনুগামীও বটে। কিন্তু ১৮৩২-এর সংস্করণে এসে দেখা যাচ্ছে — রেভারেন্ড কেরীর ভাষা অধিক সংস্কৃতগন্ধী। মনে হয়, রেভারেন্ড কেরী তদ্ভব শব্দ, মৌখিক বাক্য বিন্যাসরীতি ও বাগ্‌ভঙ্গী অপেক্ষা তৎসম শব্দাবলি ও সংস্কৃত গদ্যরীতির প্রতি সচেতনভাবেই পক্ষপাত দেখিয়েছেন। রেভারেন্ড কেরী প্রচুর তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন—পরিষ্কার, উৎস্বর্গ (উৎসর্গ), স্বাক্ষী (সাক্ষী), অবস (অবশ), পিড়িত (পীড়িত), শ্বয়ন (শয়ন), জন্ত্রনা (যন্ত্রণা), পাপি (পাপী),. পূর্ন্ন (পূর্ণ), মানব্য (মানব) ইত্যাদি। ধ্বনি অনুসরণ করে বানান লিখবার রীতি অনুসরণ করেছেন। শব্দ শেষের ‘ত’ অনেক সময়, বাংলাতে হল্‌ রূপে উচ্চারণের দিক থেকে এক হয়ে যায়। তিনি লিখেছেন সহিৎ (সহিত) ব্যথিৎ (ব্যথিত), পীড়িৎ (পীড়িত), ভবিষ্যত (ভবিষ্যৎ) ইত্যাদি। কিছু বিকৃত উচ্চারণ অবশ্য বাঙালি আবহাওয়ায় গড়ে তোলার পক্ষে সহায়ক হয়েছে। হয়তো গ্রাম্য মানুষ সেই শব্দগুলিকে সচরাচর যেভাবে উচ্চারণ করে থাকে, মোটামুটি সেইভাবেই বাংলা বাইবেলে স্থান দেওয়াতে বাঙালিভাব কিছুটা রক্ষিত হয়েছে। রূপতত্ত্বের দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বিশেষত্ব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমেই লক্ষণীয় বহুবচন নির্দেশে বিশেষত্ব। বহু-বচনাত্মক প্রত্যয় ‘দিগ’র পূর্বে ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে; এই রীতি উনিশ শতকে দীর্ঘদিন বাংলা ভাষায় প্রচলিত ছিল। স্বরান্ত শব্দে ষষ্ঠীর ‘র’ এবং হলন্ত শব্দে ষষ্ঠীর ‘এর’ যোগ করবার পর বহুবচনাত্মক প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন—ধনীরদের, শিশুরদিগকে, মানুষেরদের, দরিদ্রেরদিগকের ইত্যাদি। সাধু বাংলা ভাষায় এবং কখনো বা প্রাদেশিক কথ্য বাংলায় নামধাতুর প্রয়োগ বাহুল্য লক্ষ করা যায়। রেভারেন্ড কেরীও পর্যাপ্ত পরিমাণে নামধাতুর ব্যবহার করেছেন। যেমন—দৌড়িল, উত্তরিলেন ইত্যাদি। প্রাচীন বাংলা থেকেই কর্তৃবাচ্যের স্থলে কর্মবাচ্যের (Passive Voice) প্রয়োগ দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের ভাষাতেও এই রূপ ব্যবহারের পরিচয় আছে। রেভারেন্ড কেরী অনূদিত বাইবেলে বাংলা ভাষার এই বিশেষত্বটি বর্জন করেননি। যেমন—(১) জাহাজ ঢেউতে ঢাকা গেল (পড়ল)। (২)

দ্রাক্ষারস চুয়া যায় (চুয়ে পড়ে)। (৩) ডালের মত কাটা যায় (কাটা পড়ে)। (৪) তাহারা পোড়া যায় (দগ্ধ হয়) ইত্যাদি। এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় যৌগিক ক্রিয়া গঠনে বাংলা ভাষায় যেমন অসমাপিকা ক্রিয়ার উত্তরে অন্য এক ধাতুর সহায়তা নিতে হয়; এবং তা Idiomatic, রেভারেন্ড কেরী সেখানে 'গম' ধাতুর সাহায্য নিয়েছেন।

রেভারেন্ড কেরীর বাইবেলের বিভিন্ন সংস্করণের (১৮০১-১৮৩২) বাগ্‌ভঙ্গি ও বাক্যরীতিতে প্রায়শই বিদেশি প্রভাব স্পষ্ট। তাছাড়া অন্তিম সংস্করণের ভাষায় রেভারেন্ড কেরীর সংস্কৃতমনস্কতার অনুশাসন পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগরকে আকর্ষণ করেছিল। রেভারেন্ড কেরীর বাইবেলের ভাষায় ক্রমপরিণাম রূপ —

১৮০১	১৮০৬	১৮৩২
(ক) মধ্যেখানে	(ক) মধ্যখানে	(ক) মধ্যস্থানে
(খ) অঙ্গ অবস	(খ) অঙ্গ অবশ	(খ) পক্ষাঘাত
(গ) আইলা কাকুতি করিতে করিত।	(গ) নিকটে আসিয়া কাকুতি করিয়া।	(গ) নিকটে আসিয়া প্রার্থনা করিয়া।
(ঘ) যাহা তোমাদের ইচ্ছা তাহা নিবেদন করিলে।	(ঘ) যাহা তোমাদের ইচ্ছা প্রার্থনা করিলে।	(ঘ) যাহা তোমাদের ইষ্ট তাহা প্রার্থনা করিলে।
(ঙ) দাস জানে না তাহার প্রভু কি করেন।	(ঙ) প্রভু যে কার্য্য করেন দাস তাহা জানে না।	(ঙ) প্রভুর ক্রিয়মান কার্য্য দাস জানে না।

বর্তমান কালে 'হওয়া' ক্রিয়ার ব্যবহার বাইবেলের অনুবাদে অধিক দেখা যাচ্ছে। বিশেষত রেভারেন্ড কেরীর বাংলা বাইবেলে এই প্রবণতা আছে। সাধারণ ক্রিয়াপদের ব্যবহারে রামমোহন বাংলা গদ্যে সর্বপ্রথম দৃষ্টি দিয়েছেন এমন মনে করার কারণ নেই। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে রামমোহনের প্রথম বাংলা রচনা প্রকাশিত হবার আগেই রেভারেন্ড কেরীর রচনায় ক্রিয়াপদের যথার্থ ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ইংরেজি বাক্যরীতির প্রভাবে অনেক সময় কর্তা ও কর্মের মাঝখানে ক্রিয়াপদের ব্যবহার বাংলা বাক্যে লক্ষ করা যায় : কর্তা + ক্রিয়া + কর্ম।

'এবং সে যোহানের 'ছিল' উটের লোমের পরিচ্ছেদ'। (রেভারেন্ড কেরীর বাংলা বাইবেল থেকে)

সংযোজক অব্যয় হিসেবে 'এবং/ও' শব্দের ব্যবহার বাংলায় ছিল। কিন্তু ইংরেজি বাক্য গঠনরীতি অনুসরণ করে বাংলায় 'এবং' দিয়ে বাক্য শুরু করতে দেখা যায়। ইংরেজিতে 'and' দিয়ে বাক্য শুরু করার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি দেখা যায় বাইবেলে এবং বিশেষত নিউ টেস্টামেন্ট অংশে। উনিশ শতকের একেবারে গোড়ায় বাইবেলের বিভিন্ন অংশের বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছিল এবং এই সূত্র ধরে 'এবং' দিয়ে বাক্য

রচনার প্রবণতা বাংলা গদ্যে দেখা যাচ্ছে।

বাংলা গদ্যের লিখিতরূপ যখন গড়ে উঠছে তখন খণ্ডবাক্যের সজ্জার ক্ষেত্রে ইংরেজি আদর্শ গ্রহণ করা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে সংস্কৃতের প্রভাবের প্রশ্ন ওঠে না; কারণ সংস্কৃতে খণ্ড বাক্যসজ্জার রীতি নেই। বাংলা গদ্য, ইংরেজি খণ্ডবাক্য সজ্জার রীতি অনুসরণ করে, প্রকাশরীতির ক্ষেত্রে ক্রমশ শৃঙ্খলা লাভ করেছিল। উদাহরণ স্বরূপ —

মূল বাক্যাংশ + অধীন খণ্ড বাক্য

ঈশ্বর আজ্ঞা করিয়াছেন + যে সকল মনুষ্যেরা সপ্তাহের এক দিবস সাংসারিক কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম করিবে।

ইংরেজি থেকে বাংলায় বাইবেল অনুবাদের মাধ্যমে, মূলত খ্রিস্টান ধর্মযাজকেরা বাংলা গদ্যে বিভিন্ন যতি চিহ্নের প্রয়োগ শুরু করেছিলেন — উনিশ শতকের প্রথম দুই দশকের মধ্যেই। এই ধারা অনুসরণ করেই বাংলা গদ্যে যতি চিহ্নাদির ব্যবহার প্রবর্তিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য রামমোহনের রচনাতে পূর্ণচ্ছেদ ছাড়া অন্য কোনো যতিচিহ্ন ব্যবহৃত হয়নি। এমনকি, বিদ্যাসাগর তাঁর প্রথম দিকের রচনায় কেবলমাত্র পূর্ণচ্ছেদেরই ব্যবহার করেছেন। ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন —

> "বিদ্যাসাগরের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ বেতালপঞ্চবিংশতি, ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে দাঁড়ি ছাড়া অন্য কোনো বিরামচিহ্নের প্রয়োগ নাই। কিন্তু যতদিন যাইতে থাকে, তিনি অনুভব করেন যে, রচনা সহজে বোধ্য করিতে হইলে সকল প্রকার বিরামচিহ্নের বহুল প্রয়োগ আবশ্যক; এ বিষয়ে তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর বিদেশি লেখকদের অনুসরণ করিয়া চলিতেন।"

বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে শব্দগ্রহণের ক্ষেত্রে দুই ধরনের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। অবিকল ভাবে ইংরেজি শব্দ গ্রহণ, এবং বিকৃত উচ্চারণে বা আকারে ইংরেজি শব্দ গ্রহণ। অতিথি হিসাবে এসব আগন্তুক শব্দকে, কিছুদিনের মতো বাংলার শব্দভাণ্ডারে ভিন্ন মর্যাদার আসন না দিয়ে বরং অবয়বের পরিবর্তন করে, চিরদিনের মতো বাংলা শব্দ জগতের অধিবাসীতে পরিণত করবার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন ইংরেজি শব্দ ঠিক একই কারণেই বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম অনুসরণ করে ব্যবহার করা হয়েছে। ইংরেজি শব্দের সঙ্গে বাংলা শব্দের সন্ধি —

Gospel + অন্তর্গত = গস্পেলান্তর্গত, Christ + উপদিষ্ট = খ্রীষ্টোপদিষ্ট, বাংলা প্রত্যয় যোগে = খ্রীস্ট + ঈয় = খ্রীস্টীয়, Cross = ক্রুশ।

বাংলা ভাষায় বাইবেল প্রকাশ করতে গিয়ে, মিশনারি কেরীর মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপনের প্রচেষ্টা; সেই সঙ্গে বাংলা ভাষায় গ্রন্থ সম্পাদনা করার প্রয়াস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাংলা বাইবেলই ছিল শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা গদ্য গ্রন্থ। মিশনারি কেরী বাংলা ভাষায় বাইবেল প্রকাশ করতে গিয়ে, দেশীয় পণ্ডিতদের দিয়ে

বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনায় যে দুঃসাহসিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তা এককথায় অভূতপূর্ব, বিস্ময়কর। কারণ তিনিই প্রথম প্রভূত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাভাষাকে ভদ্র ও শিক্ষিত জনের আলোচ্য ভাষার মর্যাদা দান করেছিলেন। একদিকে আরবি, ফারসি, অন্যদিকে সংস্কৃতের চাপে বাংলাভাষা মৃতকল্প, তখন তিনিই আশ্চর্য দূরদৃষ্টি দিয়ে বাংলাভাষার নতুন রূপের আত্মপ্রকাশ ঘটান। মিশনারি কেরীর অনূদিত বাংলা বাইবেলের ভাষার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কিছু সংশয় থাকতে পারে, কিন্তু তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে নতুন বিষয় সংযোজন করে, বাঙালি পাঠকের স্বাদ পালটেছেন।

বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যকে ভাবে ও ভাষায় সমর্থ করে তুলতে কৃত্তিবাস-মালাধর গোষ্ঠীর যুগান্তকারী অনুবাদ ভূমিকা চিরস্মরণীয়। সেই মহৎ অনুবাদক গোষ্ঠীর ভূমিকার আলোকে বিদেশি ইংরেজ খ্রিস্টান মিশনারিদের দেখলে, যথাযথ মূল্যায়ণ করা হবে। তাঁদের সঙ্গে এঁদের প্রভেদ হল কৃত্তিবাস-মালাধর বঙ্গ ভাষা-ভাষী ছিলেন আর মিশনারিরা ছিলেন বিদেশি এবং ইংরেজি ভাষী। খ্রিস্টীয় সংস্কৃতির ছোঁয়ায় বাংলার চেতনায় বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধ ও জীবনধর্মী দার্শনিকতা সংযুক্ত হল। এই ঐতিহ্যের কারণেই অনেক মহৎ বাঙালি বাইবেল চর্চা করেছেন। ❑

সহায়ক পুস্তক ও পত্রিকা

- বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (প্রথম পর্যায়) – ভূদেব চৌধুরী, বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ : ১৩৬৯।
- বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস – সজনীকান্ত দাস, দে'জ পাবলিশিং ১৯৮০।
- বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (৫ম খণ্ড) – অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মর্ডান বুক এজেন্সী, ১ম সংস্করণ : ১৯৮৫।
- বাংলা সাহিত্যে গদ্য – সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮
- কালান্তরে বাংলা গদ্য – গোলাম মুরশিদ, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯৯
- বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ – শ্যামল চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯০।
- উনিশ শতকের বাংলা গদ্যসাহিত্য – অপূর্বকুমার রায়, জিজ্ঞাসা, ১৯৭৬।
- বাংলাসাহিত্যে ইউরোপীয় লেখক – সবিতা চট্টোপাধ্যায়, নয়া প্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ : ১৯৯৮
- উইলিয়াম কেরী সাহিত্য সাধনা – শক্তিব্রত ঘোষ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২৫ ডিসেম্বর ১৯৮০।
- বাংলায় বাইবেল অনুবাদ (গবেষণাপত্র) – প্রতাপ গাইন, বিশপস্ কলেজ ১৯৯২।
- বড় সাধ বড় সেবা – সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, ব্যানার্জী প্রিন্টাস, ১৯৮৯
- বাইবেল ও বাংলা সাহিত্য – সুরঞ্জন মিদ্দে, রূপসী বাংলা : ২০২২

- দোম আন্তোনিও : জীবন ও সৃষ্টি – সুরঞ্জন মিদ্দে, নান্দনিক ২০১৯
- রবীন্দ্র সাহিত্যে খ্রিস্টকথা – সুরঞ্জন মিদ্দে, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১২।
- সম্প্রীতির সাহিত্যে : সমন্বয়ের সংস্কৃতি – সুরঞ্জন মিদ্দে, নান্দনিক, ২০২০।
- বড় দিনের বাঁশি – সুরঞ্জন মিদ্দে, দি সি বুক এজেন্সী, ২০২০
- পলাশীর পরে বাংলা – সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়, মহামায়া সাহিত্য মন্দির, শেওড়াফুলী, ১৯৯৩।